OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 31
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 262 - 270
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 262 - 270
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসে দার্শনিক ভাবনা

শংকরদেব মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, আর.কে.ডি.এফ. বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি
সহকারী অধ্যাপক, শরৎ সেন্টিনারী কলেজ, ধনিয়াখালী, হুগলী
Email ID: profsdm.1979@gmail.com

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Realist, River centric, Philosophical thought, Conflict between human beings and nature, Existential crisis, Fishermen’s lives.

Abstract
The novelist Manik Bandyopadhyay was a realist writer. His ‘Padmanadir Majhi’ is a significant river-centric famous novel in Bengali literature. The novel explores profound philosophical ideas through the struggles of the impoverished fishing community living along the banks of the Padma river. Themes such as poverty, the relationship between human beings and nature, existential crisis, and the desire for survival form the central focus of this study. The present paper seeks to examine the underlying philosophical dimensions of the novel. Through the struggles of Kuber, the protagonist, the novel portrays the helplessness of the underprivileged, the uncertainty of livelihood, family responsibilities, and the persistent struggle against adverse circumstances. The Padma river serves both as a source of livelihood and shelter for the fishermen and as a force of destruction and disaster. This dual role of the river reveals the complex relationship of interdependence and conflict between human beings and nature. Although Hossain Mia’s plan to establish a settlement on Moynadwip offers the possibility of a new life, it also suggests self-interest, uncertainty, and conflict. The relationship between Kuber and Kapila further reflects the complexities of the human mind, personal desires, and moral dilemmas. Moreover, the continuous flow of the Padma symbolizes the ceaseless passage of time, deepening the philosophical significance of the novel. Through Kuber’s experiences, the narrative demonstrates how poverty and social realities influence human life, decisions, and freedom. In conclusion, ‘Padmanadir Majhi’ is not merely a realistic portrayal of fishermen’s lives; it is also a profound artistic exploration of human existence, struggle, aspiration, and uncertainty.

Discussion

বাংলায় অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষকে কেন্দ্রে সংস্থাপন করে উপন্যাস রচিত হতে শুরু হয়েছে ‘কল্লোল’ (১৯২৩) পর্বে। সাহিত্যের বিষয় এবং প্রকরণে ‘কল্লোল’ পত্রিকা নতুন পথের সন্ধান করেছিল। পশ্চিমের যথাস্থিতবাদী (Naturalist) সাহিত্যধারাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন ‘কল্লোল’ সাহিত্যপন্থীরা। কিন্তু মানুষের জীবনে শুধু অন্ধকারময় দিকই নেই। এই বিশ্বাসে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 31
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 262 - 270
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ও দৃঢ় নিশ্চয়তায় কল্লোলপন্থীদের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনদৃষ্টির পার্থক্য দেখা দিয়েছিল। ১৯৩৬ সালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাস প্রকাশের সূত্রে আমরা প্রথম সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস পেলাম এবং প্রথম সার্থক নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসও এটি। গ্রামীণ মানুষের বাস্তব জীবন উঠে এল সাহিত্যের পাতায়।

পূর্ববঙ্গের পদ্মানদী তীরবর্তী নির্দিষ্ট এলাকার, একটি সমৃদ্ধ গ্রামের দারিদ্র্যপীড়িত নির্দিষ্ট একটি পাড়ার জেলেমাঝিদের জীবনের কথাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এই উপন্যাসে বর্ণনা করেছেন। উপন্যাসের নামেই বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে। কুবের মাঝির জীবনের গতিপথ অবলম্বন করে লেখক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব সমাজবাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন। অখ্যাত অবজ্ঞাত ও গরীব কুবের মাঝির পারিবারিক জীবনের সূত্রে বিবর্তনশীল আর্থসামাজিক সত্যরূপ পাঠকের সামনে উপস্থাপনের মুন্সিয়ানায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাসের একটি নূতন দিগন্ত উন্মোচন করেছিলেন। সমকালে শুধু নয়, অদ্যাবধি 'পদ্মানদীর মাঝি' তার বিষয়বস্তুর কারণেই বাংলা সাহিত্যের একটি জনপ্রিয়তম উপন্যাস। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাসের জনপ্রিয়তার কারণ হিসাবে পদ্মানদীর মাঝিদের দুঃসাহসিক ও কিছুটা অসাধারণ জীবনযাত্রার আকর্ষণী শক্তির অভিনবত্ব এবং পূর্ববঙ্গের সরস এবং কৃত্রিমতা বর্জিত কথ্যভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগের কথা বলেছেন। তিনি উপন্যাসটির গুণবিচারের ক্ষেত্রে লিখেছেন, -

> "ইহার সম্পূর্ণরূপে নিম্নশ্রেণী-অধ্যুষিত গ্রামজীবনের চিত্রাঙ্কনে সূক্ষ্ম ও নিখুঁত পরিমিতিবোধ, ইহার সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সনাতন মানব প্রবৃত্তিগুলির ক্ষুদ্র সংঘাত ও মৃদু উচ্ছ্বাসের যথাযথ সীমানির্দেশ। এই ধীবর-পল্লীর জীবনযাত্রায় শিক্ষিত আভিজাত্যের মার্জিত রুচি ও উচ্চ আদর্শবাদের ছায়াপাত হয় নাই।"[১]

সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যিক হয়ে ওঠার পূর্ব থেকেই মধ্যবিত্ত এবং সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের জীবনকথা প্রকাশের ব্যকুলতা অনুভব করতেন। 'লেখকের কথা' প্রবন্ধগ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ 'গল্প লেখার গল্প' প্রবন্ধে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে, চাষি, মাঝি, জেলে, তাঁতিদের পীড়িত ক্লিষ্ট মুখ তাঁর মনের মধ্যে মুখর অনুভূতি হয়ে ভাষা দাও বলে চ্যাঁচাত। সাধারণ মানুষের জীবনবেদনা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন উপলব্ধি করেছিলেন তেমনই পরিবেশন করেছেন সাহিত্যের পাতায়। 'লেখকের কথা' প্রবন্ধগ্রন্থের 'সাহিত্য করার আগে' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, -

> "শৈশব থেকে সারা বাঙলার গ্রামে শহরে ঘুরে যে জীবন দেখেছি, নিজের জীবনের বিরোধ ও সংঘাতের কঠোর চাপে ভাবালুতার আবরণ ছিঁড়ে ছিঁড়ে জীবনের যে কঠোর নগ্ন বাস্তব রূপ দেখেছি সাহিত্যে কি তা আসবে না? এই বাস্তব জীবন যাদের– সেই সাধারণ বাস্তব মানুষ?"[২]

প্রসঙ্গত বলতে হয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে উল্লিখিত যে মানসিকতা পোষণ করতেন, তার মূর্তরূপ প্রকাশিত হয়েছে 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে। সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অসহায় দরিদ্র মানুষগুলি ন্যূনতম প্রয়োজন সাধনে অক্ষম। অনিবার্য সময়ক্রমের সাথে সাথে তাদের জীবনপ্রবাহ কোনক্রমে অতিবাহিত হয়। লেখকের কলমে আমরা পাই, -

> "এ-দিকে গ্রামের ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ভদ্রমানুষগুলি তাহাদের দূরে ঠেলিয়া রাখে, ওদিকে প্রকৃতির কালবৈশাখী তাহাদের ধ্বংস করিতে চায়, বর্ষার জল ঘরে ঢোকে, শীতের আঘাত হাড়ে গিয়ে বাজে। আসে রোগ, আসে শোক। টিকিয়া থাকার নির্মম অনমনীয় প্রয়োজনে নিজেদের মধ্যে রেষারেষি করিয়া তাহারা হয়রান হয়! জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, বিষণ্ণ। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতায়, আর দেশী মদে!"[৩]

কাজেই আমরা লক্ষ করি যে, বাংলা উপন্যাস তথা কথাসাহিত্যের যখন একটি পট পরিবর্তনের সূচনা হতে চলেছে, এমন সময় 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি লিখিত হয়েছে। মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়েও নানা দিক থেকে বিচ্ছিন্ন পদ্মানদী তীরবর্তী কেতুপুর গ্রামের জেলেপাড়ার মানুষজনদের নিত্যদিনের জীবনযাত্রা 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটির মূল বিষয়বস্তু।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 31
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 262 - 270
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বর্ষাকালের মাঝামাঝি এক বৃষ্টিভেজা রাত্রে পদ্মায় ইলিশ মাছ ধরার বর্ণনায় উপন্যাসটির শুরু হয়েছে। এই উপন্যাসে কেতুপুরের জেলেপাড়ার বাসিন্দা কুবেরের প্রতিনিধিত্বে পদ্মানদীর জেলে মাঝিদের জীবনচিত্র লেখক তুলে ধরেছেন। গরীব জেলেদের মধ্যে গরীবতম জেলে এই কুবের। নদীতে মাছধরার প্রধান উপকরণ নৌকা ও জাল তার নেই। ইলিশের মরশুম, বর্ষাকালে রাত জেগে অন্যের জাল ও নৌকার সাহায্যে দু-তিন আনা ভাগে মাছ ধরে তার সংসার চলে। বর্ষায় পদ্মার ইলিশের মরশুমে উপার্জন বেশি হয় বলে কুবের একদিনও মাছ ধরা কামাই করতে চায় না। জ্বর গায়ে স্ত্রীর নিষেধ উপেক্ষা করেও সে মাছ ধরতে যায়। বছরের অন্য সময় কারও কাছ থেকে জমা নেওয়া পুকুরে মাছ ধরে অথবা ধনঞ্জয় বা নড়াইলের যদুর সঙ্গে দু-তিন আনা ভাগের জোড়াতালি দেওয়া ব্যবস্থাপনায় মাছ ধরে কোনক্রমে সে সংসার চালায়। টাকার অভাবে এবার সে অখিল সাহার পুকুর জমা নিতে পারেনি। অন্য বিকল্প, অন্যের নৌকায় মাঝি হিসাবে মজুর খাটা। শারীরিকভাবে জন্মপঙ্গু স্ত্রী মালা আছে তার ঘরে। কুবের ও মালার চারটি সন্তান- মেয়ে গোপী এবং ছেলে লখা ও চণ্ডী, আর নবজাত একটি শিশুপুত্র। আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাসেও তারা বিপদমুক্তির আশায় হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকতে পারে না। রাতে মাছ ধরতে গিয়ে আশ্বিনের ঝড়ের কবলে পড়েছে তারা। পদ্মাই এদের একমাত্র আশ্রয়স্থল এবং কখনো কখনো প্রাণসংহারক মূর্তি ধারণ করে। রাতের ঝড়ে নদীতে কারও প্রাণবিয়োগ না হলেও ঝড়ে জেলেপাড়ার প্রায় প্রত্যেকের কমবেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আমিনুদ্দির স্ত্রী ও ছেলে মারা গেছে। কুবেরের মেয়ে গোপী পায়ে খুব চোট পেয়েছে। আশ্বিনের এই ঝড় জেলেপাড়ার ঘরগুলিকে আবর্জনার মতো চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাদের জীবনকে আরও দুর্বিষহ করে দিয়েছে। কেতুপুরের জমিদার বাড়ির মেজবাবু অনন্ত তালুকদার জেলেপাড়ার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়নের চেষ্টা করেছিলেন। তাতে কারও বিশেষ উপকার হয়নি। জেলেপাড়ার নারীদের নামে শুধুমাত্র কলঙ্ক রটেছে। এই গ্রামে জেলেপাড়ায় নোয়াখালি অঞ্চল থেকে বেশকয়েক বছর আগে দীনহীন অবস্থায় একদিন হোসেন মিয়া এসেছিল। এখন সে একজন বিশেষ ধনী ব্যক্তি। সে সবসময় নানা বিপদাপদে জেলেপাড়ার গরীব মাঝিদের সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়। তার সাহায্যের পিছনে সর্বদা গভীর এক একটি স্বার্থসিদ্ধির মতলব থাকে। সকলেই তা বুঝতে পারে, কিন্তু মুখে কেউ কিছু বলতে পারে না। হোসেনের সাহায্যকে কেউ উপেক্ষাও করতে পারে না। কেতুপুর থেকে বহুদূর সমুদ্রের মধ্যে জঙ্গলময় ময়নাদ্বীপ সে নিলামে কিনেছে। সেখানে সে চরম উৎসাহে এবং যথাশক্তি নিয়োগ করে মানুষের বসতি স্থাপন করতে চায়। ময়নাদ্বীপে শোষণমুক্ত কৃষিভিত্তিক একটি সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়। তাই বহু জায়গা থেকে, এমনকি কেতুপুরের জেলেপাড়া থেকেও গরীবদের সে ময়নাদ্বীপে নিয়ে যায়। অর্থনৈতিক কারণে যারা সংসারক্ষেত্রে পরাজিত কিন্তু সন্তান উৎপাদনে সক্ষম তাদেরই ময়নাদ্বীপে আশ্রয় দেয়। জেলেপাড়ার গরীব মাঝি কুবের ঘটনাচক্রে আপন শ্যালিকার সঙ্গে প্রেমের এক রহস্যময় সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। সে আকস্মিক চুরির দায় এড়ানোর জন্য হোসেন মিয়ার সাহায্য চায়। হোসেন তাকে ময়নাদ্বীপে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। নিরুপায় কুবের রাতের অন্ধকারে কপিলাকে সঙ্গে নিয়ে হোসেন মিয়ার নৌকায় ময়নাদ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। কুবেরের বৃত্তি বদলের সম্ভাবনার মধ্য দিয়ে উপন্যাসটি শেষ হয়েছে।

কুবেরের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সামর্থ্য, অবস্থা ও কৌশলগত ভুলভ্রান্তি, অবদমিত বাসনার অনিয়ন্ত্রিত রূপ প্রকাশিত হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ বাস্তব মানুষ রূপেই এ উপন্যাসে কুবের উপস্থাপিত। পদ্মানদী তীরবর্তী কেতুপুরের জেলেপাড়ার যে দারিদ্র্যপীড়িত লোকায়ত জীবনের ছবি উপন্যাসটিতে প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে মূল তথা প্রধান সমস্যা হল সীমাহীন দারিদ্র্য। জেলেমাঝিদের জীবনযাপনের প্রতিটি পদক্ষেপে অর্থনৈতিক অভাব অনটনের কারণে তাদের নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তাদের মানসিক ও নৈতিক পতন কোন্ পর্যায়ের তা ঔপন্যাসিক উপন্যাসে বর্ণনার পরতে পরতে সবিশেষ সহমর্মিতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

‘পদ্মানদীর মাঝি’ নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস। এই উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে নদীর প্রত্যক্ষ যোগ পাঠক অনায়াসে অনুভব করতে পারেন। নদীনির্ভরতাই ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসের দরিদ্র মানুষদের একমাত্র অবলম্বন। নদী তার আপন মহিমাতেই নানাভাবে ও নানা মাত্রায় মানবজীবনকে অলোড়িত ও আবেশিত করে। কিন্তু কোনো ঔপন্যাসিকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং মননে মানবজীবন সম্পর্কিত ভাবনাচিন্তায় একটি নদী ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক গুরুত্ব অতিক্রম করে দার্শনিক অভিব্যক্তিও লাভ করতে পারে। যার সঙ্গে পাঠকেরও নতুন জীবনদৃষ্টি গড়ে উঠতে পারে ও আপন ভাবনার

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 31
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 262 - 270
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পথ উন্মুক্ত হতে পারে। নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে যে জীবনের কথা লেখক তুলে ধরেন, সেটা তাঁর বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে নিজস্ব সম্পদ। সেই বাস্তবতার সঙ্গে চিরন্তনতার একটি যোগসূত্র থেকেই যায়। এখানে সময়কাল (উপন্যাসের ও নদীর ক্ষেত্রে) অবশ্যই একটি জরুরি বিষয়- যার নিরিখে অচেনা ছবি পাঠকের চেতনার সাগরে ঢেউ জাগাতে পারে। আবার একই নদী ভিন্ন ভিন্ন লেখকের দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধরা দেয়। কোনো কোনো উপন্যাসে নদী বিভিন্ন রকম চরিত্র হিসাবে উঠে আসে এবং বিভিন্ন চরিত্রের মনে নদী সম্পর্কে প্রতিক্রিয়াও আলাদা রকমের হয়। কখনো কখনো জীবন ও নদী মহাকালপ্রবাহে একার্থবোধকও হয়ে ওঠে। নদীর চলার সঙ্গে জীবনের চলার তুলনা-প্রতিতুলনা স্বাভাবিকভাবে মানুষের মানসপটে নানা মাত্রার ছাপ ফেলে যায়।

একটি নদীর পথ চলায় ঔপন্যাসিক দর্শনসিদ্ধ মননে সপ্রাণ আবেগ খুঁজে পান। আর সেই প্রাণপ্রাপ্ত আবেগে নদী ঔপন্যাসিকের চেতনায় স্বতন্ত্র পরিচয়ে ধরা দেয়। উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনার প্রেক্ষিত এবং কালের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু প্রবহমান সময়ধারায় সাহিত্যিকের জীবনদর্শনের কোনো পরিবর্তন হয় না। তবে নবকালের পাঠকমনের প্রতিক্রিয়া তো আলাদা আলাদা হতেই পারে।

জীবনে বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহরত জেলেদের নৌকার পদ্মাবক্ষে সারারাত অনির্বাণ জোনাকির মতো ক্ষীণ আলো জ্বেলে ঘুরে বেড়ানোর বর্ণনায় লেখকের হতদরিদ্র মানুষদের প্রতি মূর্ত মানবিকতার স্পর্শ অনুভব করা যায়। নিমেষেই লেখক আমাদের কঠোরভাবে পরিশ্রম করা ও জীবনসংগ্রামী জেলেমাঝিদের জীবনের সান্নিধ্যে নিয়ে যান। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় আমরা পাচ্ছি, -

> "পদ্মার ইলিশ মাছ ধরার মরশুম চলিয়াছে। দিবারাত্র কোন সময়েই মাছ ধরিবার কামাই নাই। সন্ধ্যার সময় জাহাজ ঘাটে দাঁড়াইলে দেখা যায় নদীর বুকে শত শত আলো অনির্বাণ জোনাকির মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জেলে নৌকার আলো ওগুলি। সমস্তরাত্রি আলোগুলি এমনিভাবে নদীবক্ষের রহস্যময় ম্লান অন্ধকারে দুর্বোধ্য সঙ্কেতের মত সঞ্চালিত হয়। এক সময় মাঝ রাত্রি পার হইয়া যায়। শহরে, গ্রামে, রেলস্টেশনে ও জাহাজঘাটে শান্ত মানুষ চোখ বুজিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। শেষ রাত্রে ভাঙা ভাঙা মেঘে ঢাকা আকাশে ক্ষীণ চাঁদটি উঠে। জেলে নৌকার আলোগুলি তখনও নেভে না।"[৪]

সময় ও নদীর স্রোত কোনোদিন থেমে থাকে না। একথা ধ্রুব সত্য। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে সময়ধারার সঙ্গে বয়ে চলা জেলে মাঝিদের জীবনধারা কেমনভাবে প্রবাহিত হয় তা ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় আমরা পাই, -

> "দিন কাটিয়া যায়। জীবন অতিবাহিত হয়। ঋতুচক্রে সময় পাক খায়, পদ্মার ভাঙন-ধরা তীরে মাটি ধ্বসিতে থাকে, পদ্মার বুকে জল ভেদ করিয়া জাগিয়া উঠে চর, অর্ধ শতাব্দীর বিস্তীর্ণ চর পদ্মার জলে আবার বিলীন হইয়া যায়। জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোন দিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধাতৃষ্ণার দেবতা, হাসিকান্নার দেবতা, আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোন দিন সাঙ্গ হয় না।"[৫]

রোগ, শোক, অভাব, ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতায় তাদের মৃত্তিকালগ্ন জীবন অতি সাধারণভাবে অতিবাহিত হয়।

নদীতে মাছ ধরে কায়ক্লেশে যাদের জীবনযাপন করতে হয়, নানা অভাবদৈন্যের কারণে তারাই স্বার্থপর মানুষের ইচ্ছা অনুসারে চলতে বাধ্য হয়। আমরা দেখি নদীর সঙ্গে জেলেদের জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু নদীর অবাধ গতিধারার সঙ্গে জেলেপাড়ার মানুষগুলির জীবনধারা সহগামী হয়ে উঠতে পারে না। তবুও নদীই এই মানুষগুলির জীবনে একমাত্র নির্ভরতা দান করে। নদী ও নদীতীরবর্তী অন্যান্য মানুষের সঙ্গে কেতুপুরের জেলেপাড়ার এই প্রান্তিক মানুষদের বিচিত্র সম্পর্কের টানাপোড়েন। লেখকের জীবনদর্শনের আয়নায় প্রতিফলিত নদী, নিসর্গ ও মানুষের চিরন্তন সম্পর্কের মেলবন্ধন এই উপন্যাসের অন্যতম এক বিশিষ্টতা। গভীর খাতে বয়ে চলা পদ্মার বর্ণনায় লেখক বলছেন, -

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 31
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 262 - 270
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "পদ্মা তো কখনও শুকায় না। কবে এ নদীর সৃষ্টি হইয়াছে কে জানে। সমুদ্রগামী জলপ্রবাহের আজও মুহূর্তের বিরাম নাই। গতিশীল জলতলে পদ্মার মাটির বুক কেহ কোনদিন দেখে নাই, চিরকাল গোপন হইয়া আছে।"[৬]

এই উপন্যাসে জেলেমাঝিদের প্রতিনিধি কুবের। তার জীবন কাহিনি বর্ণনার মধ্য দিয়ে প্রান্তিক মানুষের জীবনের ছবি উপন্যাসে উদ্ভাসিত হয়েছে। রথের পূর্বরাত্রে সারারাত মাছ ধরার কাজ করে বাড়িতে ফিরে কুবের খেয়েদেয়ে ঘুমিয়েছিল। একটু বেলা হলেই সহযোগী গণেশ এসে তাকে জাগিয়েছে। নদীর ওপারে সোনাখালিতে রথের মেলা বসে। কুবের, গণেশ ও ধনঞ্জয় নৌকা নিয়ে মেলায় যাবে। ছেলেমেয়েরা যাবে, সঙ্গে অন্যযাত্রীরা যদি মেলা দেখার জন্য যায়, তবে কিছু আয়ের সম্ভাবনা আছে। তাই হোগলা দিয়ে নৌকায় একটি অস্থায়ী আচ্ছাদন তৈরি করা দরকার। ঘুম থেকে জেগে গণেশকে নিয়ে কুবের একটু চিড়া ও গুড় সহযোগে জলযোগ করেছে। কিছুটা বাকি থাকতে থাকতে কুবের চিড়াগুলি বড়ো ছেলে লখাকে দিয়ে দিল। কুবের তার ছেলে লখার ছোটো ভাই চণ্ডীকেও চিড়ার একটু ভাগ দিতে বলল। কিন্তু লখা একাই সব খেতে চায়। এই নিয়ে দুইভাই কলহ করে। কুবের ইচ্ছা করে এবিষয়ে উদাসীন থাকে। এর কারণ হিসাবে লেখক বর্ণনা করেছেন, -

> "এ যে তাহার ঠিক উদাসীনতা তা বলা যায় না। মনে মনে তাহার একটা উদ্দেশ্যই বুঝি আছে। শিক্ষা হোক। নিজের নিজের ভাগ বুঝিয়া লইতে শিখুক! দুদিন পরে জীবন যুদ্ধে সমস্ত জগতের সঙ্গে যখন তাহাদের লড়াই বাধিবে তখন মধ্যস্থতা করিতে আসিবে কে?"[৭]

এখানে, এই কথাটি দৃষ্টিগ্রাহ্য যে, 'সমস্ত জগতের সঙ্গে যখন তাহাদের লড়াই বাধিবে'। লেখক মনুষ্য জগৎ ও প্রাকৃতিক জগতের কথাই এখানে নির্দেশ করেছেন বলেই আমরা মনে করি। এটা লেখকের একটি বাস্তব জীবনদর্শন। লড়াই করেই জীবনে বেঁচে থাকতে হয়।

ধনঞ্জয়ের নৌকাখানা মেলায় নিয়ে যাওয়ার উপযোগী করে রাখার মানসেই তারা ঘাটের দিকে রওয়ানা হয়। যেতে যেতে ঘাটের কাছাকাছি গিয়ে দেখে, গুড়িগুড়ি বৃষ্টিতে ছাতা মাথায় দিয়ে হোসেন মিয়া ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে প্রাথমিক কুশল বিনিময় হয়। তারপর সামান্য কিছু কথাবার্তার পর হোসেন জানায় যে, দুয়েক দিনের মধ্যে খুব ঝড়বৃষ্টি হতে পারে। কলকাতা থেকে হোসেন এ খবর শুনে এসেছে। খবরটি শুনে মেঘলা আকাশ এবং নদীর সামগ্রিক পরিস্থিতি দেখে তারা কিছুটা ভীত হয়ে পড়ে। আকাশ, নদী ও সমগ্র বাদলা পরিবেশটি লেখকের বর্ণনায়, -

> "কুবের আকাশের দিকে ও নদীর দিকে চাহিল। পাতলা কুয়াশার মত মেঘ আকাশ ভরিয়া আছে, নিস্তরঙ্গ পদ্মার বুকে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিপাতে অসংখ্য ছোট ছোট বুদবুদ উঠিয়া ফাটিয়া গেলে যেমন দেখায় তেমনি দেখাইতেছে। নদীর অপর তীর চোখে পড়ে না, নদীর মাঝখানের নৌকা পর্যন্ত অস্পষ্ট। আরও এদিকে একটি স্পষ্টতর নৌকার দিকে চোখ রাখিয়া কুবের সংক্ষেপে প্রশ্ন করিল, যামুনা মেলায়? বারণ করেন নাকি মিয়া বাই?"[৮]

হোসেন মিয়াকে একজন রহস্যময় লোক বলে এমনিতে কুবের ভয় করে। তাই উপন্যাসে এই আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস নিয়ে হোসেন মিয়ার শারীরিক উপস্থিতি ভবিষ্যতে কুবেরের জীবনে নানান অস্বাভাবিক পট পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয় বলে আমাদের মনে হয়।

সময়ধারার বয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিতে শরতের আবির্ভাবের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। শীতলের কাছ থেকে পাওনা টাকা অনেক ঝগড়াঝাঁটি করে আদায় করে বাড়ি ফেরার পথে শরতের আবির্ভাবের চিহ্ন কুবেরের চোখে পড়ে। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় আমরা পাচ্ছি, -

> "মাঠের দিকে চাহিলে বোঝা যায় জল কোথায় নামিয়া গিয়াছে, ধানের ফসল কাত হইয়া পড়িয়া আছে। পদ্মা হইতে আজ জোর বাতাস বহিতেছিল, চারিদিকে অসংখ্য পাখির কলরব, শিশিরভেজা ডাঙায়

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 31
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 262 - 270
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> ছড়াইয়া আছে সোনার রোদ, শরৎকাল আসিয়া পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। নদীতীরে কাশের বন এবার সাদা হইয়া উঠিবে।”[৯]

আশ্বিন মাসে একদিন প্রবল ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেল। তাতে জেলেপাড়ার প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। আমিনুদ্দির ছেলে ও স্ত্রী মারা যায়, কুবেরের মেয়ে গোপীর পা ভাঙে। প্রাথমিক টোটকায় কোনো কাজ হয় না। যেদিন দুর্গাপূজা শেষ হচ্ছে সেইদিন গোপীকে আমিন বাড়ির মহকুমা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। যারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল রাসু, গণেশ, যুগল - তারা বাড়ি ফিরে যায়। কপিলা ও কুবের থেকে গেল। বিকালে তারা আবার গোপীকে একবার দেখে তারপর বাড়ি ফিরবে। নদীর ঘাটে এসে তারা নানা নৌযান চলাচল এবং লোকজন দেখতে থাকে। পূজাশেষের দিনেও শেষবেলায় বহু মানুষ দেশগ্রামে ফিরছে। গোপীর জন্য কুবেরের মনটা খুব ব্যথিত হয়। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় আমরা পাচ্ছি, -

> “সেইখানে নদীতীরে দাঁড়াইয়া তাহারা চাহিয়া থাকে, চক্রাকারে পাক দিয়া জাহাজ আসিয়া ভিড়ে জেটিতে। কী ভিড় হইয়াছে আজ জাহাজে! আজ পূজা শেষ, আজও দেশ-দেশান্তরের মানুষ গৃহে ফিরিতেছে। আর, কী অদৃষ্ট কুবেরের। মেয়েটাকে আজ এই বিদেশে হাসপাতালে ফেলিয়া রাখিয়া মূঢ়ের মত সে দাঁড়াইয়া আছে নদীতীরে, কোথায় যাইবে কী করিবে ঠিক নাই! ভোঁ দিয়া জাহাজ ছাড়িয়া যায়। নদীর আলোড়িত জল ঢেউ তুলিয়া তীরে আছড়াইয়া পড়ে। মেয়েটার জন্য এমনি ঢেউ উঠিয়াছে কুবেরের বুকে।”[১০]

ইলিশের মরশুম শেষ হওয়ার পর, কর্মহীন কুবেরকে বাড়িতে এসে যেচে হোসেন মিয়া তার নৌকায় কাজ করার কথা বলে। কুবের হোসেনের বিশেষ স্বার্থসিদ্ধির মতলব আন্দাজ করতে পেরেও তাকে না বলতে পারে না। আগেই বলেছি, হোসেনকে কুবের ভয় করে, এড়িয়ে চলতে চায়। কিন্তু তার উপকার (স্বার্থসিদ্ধির উপায়) গ্রহণ না করেও পারে না। মূল কারণ অর্থদৈন্য। ঔপন্যাসিক খুব চমৎকৃতির সঙ্গে কুবেরের তখনকার মানসিক পরিস্থিতির বর্ণনা করেছেন, -

> “লোকটার মৃদু হাসি-ভরা মুখের দিকে চাহিয়া যত ভয় করে কুবেরের, সেই ভয়ের তাড়নাতে ওকেই যেন জড়াইয়া ধরিবার প্রয়োজন তত বাড়ে। তাছাড়া, আজ পর্যন্ত ক্ষতি সে তাহার কিছুই করে নাই, বরং উপকার করিয়াছে অনেক।”[১১]

হোসেন মিয়ার নৌকায় কাজ নিয়ে প্রথম দেবীগঞ্জ থেকে আমিনবাড়িতে বিড়ির চালান পৌঁছে দিয়ে দ্বিতীয় চালানে যাচ্ছে কুবের। এবার তারা মানুষ নিয়ে যাবে; বহুবার শোনা, বহুরকম ভীতির স্থান ময়নাদ্বীপে। প্রায় পনেরো-কুড়ি দিন বাড়ির বাইরে থাকতে হবে। তাই কুবেরের মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজীবন পদ্মাতীরে পদ্মানদীর জলহাওয়ায় বেড়ে ওঠা, পদ্মার বুকে নৌকা ভাসিয়ে জীবিকানির্বাহ করা মাঝির নদীতে চলার জীবনছন্দো আলাদা আনন্দ দান করে। নদীর বুকে ভেসে চলাই যেন তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। কারণ নদীই তার জীবন, প্রেম ও ভালোবাসা। লেখকের বর্ণনায় আমরা পাই, -

> “নদীকে সে বড় ভালবাসে, নদীর বুকে ভাসিয়া চলার মত সুখ আর নাই। একে একে কতগুলি লঞ্চ ও স্টীমার দুদিক হইতে ঢেউ তুলিয়া আগাইয়া যায়, সম্মুখের বোঝাই নৌকাগুলি পড়ে পিছনে। কোথাও নদীর একটি ছাড়া তটরেখা নাই, কোথাও অপর তীরের গাছপালা অস্পষ্ট চোখে পড়ে। কাউয়াচিলা পাখিগুলি ক্রমাগত জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। বকেরা এখন একক শিকারী, সন্ধ্যায় ঝাঁক বাঁধিবে। স্টীমার, নৌকা, ভাসমান কচুরিপানা, আকাশের পাখি ও মেঘ ভাসিয়া চলিয়াছে, তীরের দিকে চাহিয়া মনে হয় জলের সীমায় মাটির তীরভূমিও বুঝি লঘুগতিতে চলিয়াছে পিছনে।
> “তবু নদী ছাড়া সবই বাহুল্য। আকাশের রঙীন মেঘ ও ভাসমান পাখি, ভাঙন ধরা তীরে শুভ্র কাশ ও শ্যামল তনু, নদীর বুকে জীবনের সঞ্চালন, এসব কিছুই যদি না থাকে, শুধু এই বিশাল একাভিমুখী জলস্রোতকে পদ্মার মাঝি ভালবাসিবে সারাজীবন। মানবী প্রিয়ার যৌবন চলিয়া যায়, পদ্মা তো

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 31
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 262 - 270
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> চিরযৌবনা। বৈচিত্র? কী তার প্রয়োজন? নূতন পৃথিবী কে খোঁজে, কে চায় পদ্মার রূপের পরিবর্তন, শুধু ভাসিয়া চলার অতিরিক্ত মোহ?”[১২]

নদীর সঙ্গে বংশপরম্পরায় কুবেরের নাড়ীর যোগ রয়েছে। নদীর ‘একাভিমুখী জলস্রোত’ই তার ভালোলাগার মূল আকর্ষণীয় বিষয় বলে লেখক উল্লেখ করেছেন। নদী আর নদীর মাঝি এখানে একাত্ম হয়ে গেছে।

ময়নাদ্বীপের জঙ্গলের ভিতরের দিকে, জনবসতি থেকে প্রায় এক মাইল দূরে মাটি রবিশস্যের উপযোগী কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য অল্প একটু অংশ পরিষ্কার করা হচ্ছে। কুবের সে জায়গা একদিন দেখতে গিয়েছিল। তাতে তার যে অনুভূতি হয়েছে, তা ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় পাচ্ছি, -

> “এই দ্বীপটির সৃষ্টির দিন হইতে যে বনভূমি কুমারী, তাহার বুকের এক খাবলা মাংস যেন সকলে ছিনাইয়া লইয়াছে, চারিপাশে নিবিড় বনের মাঝখানে পরিষ্কৃত স্থানটুকু এমনি বীভৎস দেখায়।”[১৩]

এখানে মানবসভ্যতা পত্তনের আদিরূপটি কুবের চাক্ষুষ করেছে। তার মাঝবয়স পর্যন্ত, আজন্ম পালিত বংশপরম্পরায় অনুশীলন করা জীবিকা ও কর্মকুশলতা ছেড়ে বাঁচবার জন্য অন্যতর একটি আনকোরা জীবিকা গ্রহণ করা, তার কাছে ঠিক একই রকমের বীভৎস ও সংগতিহীন মনে হওয়া স্বাভাবিক।

প্রেমের আকর্ষণে, পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই কপিলাকে হঠাৎ দেখতে গিয়ে কুবের যখন আকস্মিকভাবে জ্বরে আক্রান্ত হয়, তখন কিছু মৌলিক চিন্তাভাবনাসূত্রে কুবের একটি সত্য উপলব্ধি করে। পদ্মানদীর মাঝির পদ্মাই একমাত্র আপন ও শুশ্রূষার স্থান। পদ্মার সান্নিধ্যেই সে সুস্থ হয়ে উঠবে এবং ভালো থাকবে। আমরা দেখি, আজন্মের অভ্যাস ও জলহাওয়ার জন্য তার অন্তর ব্যাকুল হয়ে পড়ে। কুবেরের এই মনোভাবনার প্রকাশ ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় যেভাবে ধরা পড়েছে, -

> “পদ্মানদীর কূল ছাড়িয়া দশ মাইল তফাতে চলিয়া আসিয়াছে সে, মন কেমন করিতেছে তাহার। গাঙের বাতাস গায়ে না লাগিলে কেতুপুরের মেছো গন্ধ না শুঁকিলে, সে সুস্থ হইবে না।”[১৪]

তবে স্বার্থপর মানুষের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, পরিবর্তিত পরিস্থিতির চাপে এই প্রকৃতিলালিত জীবনেরও পরিবর্তন আমরা লক্ষ করেছি।

আকুরটাকুরে কপিলার সঙ্গে দেখা করে ব্যর্থমনোরথ কুবের আমিনবাড়ির হাসপাতাল থেকে গোপীকে নিয়ে গ্রামে ফেরে। একদিনের প্রবল জ্বরে ভুগে এবং মনোকষ্টে তার চেহারার অনেকখানি পরিবর্তন হয়ে গেছে। বিষয়টি মালার চোখে ধরা পড়েছিল। কিন্তু মালার কোনো প্রশ্নের জবাব ইচ্ছা করেই সে দিতে চায়নি। কুবের কেমন যেন একেবারে নতুন মানুষে পরিনত হয়ে গেছে। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় আমরা পাচ্ছি, -

> “অল্প সময়ের মধ্যে অকস্মাৎ অনেকগুলি বিচিত্র অভিজ্ঞতা কুবেরকে যেন নতুন মানুষ করিয়া দিয়াছে, নদীতীরে একটা জীবনে তাহার গত কয়েকটি মাস চিরস্মরণীয়। কোথায় ছিল কপিলা, কোথায় ছিল আশ্বিনের ঝড়, কোথায় ছিল ময়নাদ্বীপ! সব একসঙ্গে ভীড় করিয়া আসিয়াছে তাহার জীবনে।”[১৫]

হোসেন মিয়া সোনাখালির (নোয়াখালি অঞ্চলের) একটি পাত্রের সঙ্গে গোপীর বিয়ে ঠিক করে দিয়েছে। বিয়ের পরে হোসেন তাদের ময়নাদ্বীপে নিয়ে যাবে। এই বিষয়ে কুবেরের মনটা যন্ত্রণাবিদ্ধ হলেও এর বিরুদ্ধতা সে করতে পারবে না। তার মানসিক অবস্থার বর্ণনায় লেখক লিখেছেন, -

> “ময়নাদ্বীপে গিয়া গোপীকে বাস করিতে হইবে ভাবিলে জালে আবদ্ধ ইলিশ মাছের মত মাঝে মাঝে তাহারও মনটা কি ছটফট করে না?”[১৬]

কারণ, বসবাসের অযোগ্য ময়নাদ্বীপ সে নিজের চোখে দেখে এসেছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 31
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 262 - 270
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

গোপীর বিয়েতে কপিলাও এসেছিল এবং কিছুদিনের জন্য সে থেকে যায়। গোপীর বিয়ের দুই দিন পরে, মাইল দশেক উজানে একটি গ্রামের ঘাটে কুবের ও অন্যান্য মাঝিরা হোসেনের পাটের চালান আনতে যায়। অনেক রাত্রে তারা দেবীগঞ্জে ফিরে আসে। সবাই শ্রান্ত। রাত বেশি হওয়াতে নৌকা কেতুপুরে ফেরে না। কপিলার সান্নিধ্য লাভের আশায় কুবের একাই নদীর তীর ধরে বাড়ির দিকে রওনা হয়। ঘাটের কাছে পৌঁছে সে দেখতে পায়, সাদা কাপড় পরে গভীর রাত্রে কে একজন রমণী দাঁড়িয়ে আছে। সেই জনমানবহীন, সাড়াশব্দহীন ঘাটে একা রমণীর সাদা শাড়ী হাওয়ায় উড়ছে। অশান্ত পদ্মা আপন ছন্দে বয়ে চলেছে। লেখকের বর্ণনায় আমরা পাচ্ছি, -

> "কোন দিকে মানুষের সাড়া নাই, পদ্মার জল ছলাত ছলাত করিয়া আছড়াইয়া ভাঙা তীরকে ভাঙিবার চেষ্টা করিতেছে, নদীর জোর বাতাসে সাদা কাপড় উড়িতেছে একাকিনী রমণীর।"[১৭]

এ যেন দারিদ্র্যপীড়িত কুবেরের ভঙ্গুর জীবনের পরাজয়ের পতাকা। এর কিছুক্ষণ পরেই রাতের অন্ধকারে নিজের অস্তিত্ব (বিগতদিনের জীবন ও পরিচিতি) হারিয়ে নতুন জীবনের পথে তাকে পাড়ি দিতে হবে। আসন্ন হাজতবাসের বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাকে ময়নাদ্বীপে যেতে হয়। ময়নাদ্বীপগামী নৌকায় উঠে তাকে চোখের জল ফেলতে দেখা যায়। জীবন যেমনই হোক তার জন্য একটি মায়ামোহ থাকে। ভাবী জীবনের সংশয় এবং অতীত জীবনের মোহের সীমান্তে সে উপনীত। এখান থেকে আর ফিরে যাওয়া যাবে না। যদি সে ফিরে যায়, তাহলে তাকে অনেক কিছুই হারাতে হবে। চিরন্তন সময়ধারা এমনই গতিছন্দে চলমান। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, অতীত অবরুদ্ধ, অতীতে প্রবেশের উপায় নেই। যা-কিছু ভোগ-ত্যাগ, আনন্দ-বেদনা সবই বর্তমানের সীমানার মধ্যেই ঘটে থাকে। বোধহয় একথা বলা যায় যে, কেতুপুরের কুবের জেলেমাঝিদের প্রতিনিধি, ময়নাদ্বীপের কুবের সর্বমানবের প্রতিনিধিত্ব করবে। এখানে লেখকের দার্শনিক মননের বিস্তার লক্ষ করা যায়।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীকুমার, 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০০৪-২০০৫, পৃ. ৫১৬
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, 'লেখকের কথা ও সমকালের গল্প' (ভূমিকা ও সম্পাদনা সুশান্ত পাল), পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ২০২৪, পৃ. ৭৮
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, 'পদ্মানদীর মাঝি', বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ত্রয়োত্রিংশ মুদ্রণ: অগ্রহায়ণ, ১৪০৯, পৃ. ১১
৪. তদেব, পৃ. ৫
৫. তদেব, পৃ. ১১
৬. তদেব, পৃ. ১১
৭. তদেব, পৃ. ১৬
৮. তদেব, পৃ. ২০
৯. তদেব, পৃ. ৪৬
১০. তদেব, পৃ. ৫৬
১১. তদেব, পৃ. ৬৫
১২. তদেব, পৃ. ৭৩
১৩. তদেব, পৃ. ৭৯
১৪. তদেব, পৃ. ৮৬-৮৭
১৫. তদেব, পৃ. ৮৭

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 31
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 262 - 270
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১৬. তদেব, পৃ. ৯৬
১৭. তদেব, পৃ. ১০৩

Bibliography:

সেন, সুকুমার, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ৫ম খণ্ড (১৮৯১-১৯৪১), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ১৩৬৫ (১৯৫৮), একাদশ মুদ্রণ: আগস্ট, ২০২২
রায়, সত্যেন্দ্রনাথ, 'বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ২০০০, মাঘ, ১৪০৬, পুনর্মুদ্রণ: এপ্রিল, ২০২২, বৈশাখ, ১৪২৯
মজুমদার, ড. সমরেশ, 'পদ্মানদীর মাঝি: পরিমিতি ও সৌষম্য', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, চতুর্থ পরিমার্জিত সংস্করণ শারদ উৎসব, ২০০৪, পুনর্মুদ্রণ: ২০১১
সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, 'কল্লোল যুগ', এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: আশ্বিন, ১৩৫৭, দ্বাদশ প্রকাশ: মাঘ, ১৪২৬
মিত্র, ড. সরোজমোহন (সম্পাদনা), 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও পদ্মানদীর মাঝি', প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ২৯শে ভাদ্র, ১৪১০, পুনর্মুদ্রণ: অক্টোবর, ২০২১
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীকুমার, 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ: ২০০০-২০০১
বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ১৯৬১, নবম সংস্করণ: জানুয়ারি, ২০২১, মাঘ, ১৪২৭
সিকদার, অশ্রুকুমার, 'আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস', অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ: অগ্রহায়ণ, ১৪১৫, নভেম্বর, ২০০৮
মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, 'কালের প্রতিমা (বাংলা উপন্যসের পঁচাত্তর বছর: ১৯২৩-১৯৯৭), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল, ১৯৭৪, বৈশাখ, ১৩৮১, পুনর্মুদ্রণ: অগ্রহায়ণ, ১৪২৯, নভেম্বর, ২০২২
রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ: ডিসেম্বর, ১৯৯৭
দত্ত, সরোজ, 'ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ৫ই জৈষ্ঠ, ১৪০০, ১৯ মে, ১৯৯৩
দাশ, শিশিরকুমার, 'বাংলা সাহিত্যসঙ্গী' (সংকলন ও সম্পাদনা), শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি., কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ২০০৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ: আগস্ট, ২০১০
ভট্টাচার্য, বিশ্ববন্ধু, 'কথাশিল্পী: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: বইমেলা, ২০০৪
মজুমদার, সমরেশ, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি', রত্নাবলী, কলকাতা, দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ: আশ্বিন, ১৪০১, মহালয়া, অক্টোবর, ১৯৯৪, তৃতীয় মুদ্রণ অগ্রহায়ণ, ১৪০৪, ডিসেম্বর, ১৯৯৭
রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, 'দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ: শ্রাবণ, ১৪১৭, আগস্ট, ২০১০
সেন, কানাই, 'মানিক উপন্যাস: জীবনের জটিলতা', পুঁথি প্রকাশনা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ৪-ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫
গুপ্ত, ক্ষেত্র, 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস', পঞ্চম খন্ড, গ্রন্থ নিলয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ২০০৫
নন্দী, ড. অশোককুমার, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি', সাহিত্য সঙ্গী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ১৫ই আগস্ট, ২০০৩